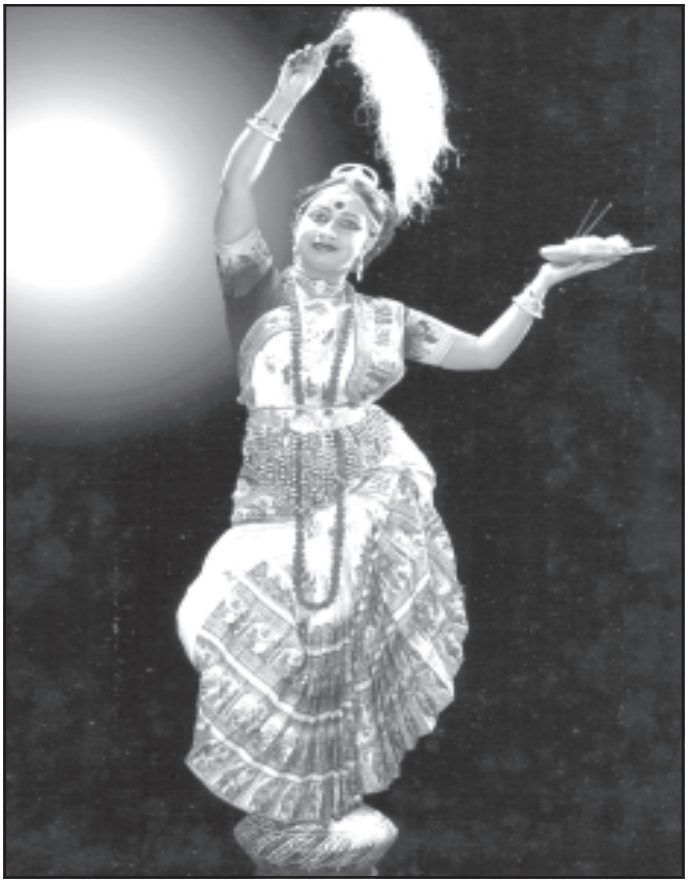

গৌড়ীয় নৃত্য

কাবেরী পুইতুণ্ডি কর

এই বিশ্ব সংস্কৃতি অমূল্য সম্পদের ভাণ্ডার। নৃত্যকলা হল এই অমূল্য সম্পদের একটি। আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন ধরনের নৃত্যশৈলীর প্রচলন চলে আসছে। বিবর্তনের পথ বেয়ে স্বাধীনতার কিছু আগে এবং স্বাধীনতার কিছু পরে এগুলি স্বীকৃতি লাভ করেছে। মণিপুরী, ভরতনাট্যম, কুচিপুড়ি, কথাকলি, মোহিনী নাট্যম, কত্থক ও ওড়িশি— এই নৃত্যশৈলীগুলি আগে স্বীকৃতি লাভ করলেও ভারতীয় নৃত্যধারার সর্বাধুনিক সংযোজন হচ্ছে অসমের 'সত্রিয় নৃত্য' ও বাংলার 'গৌড়ীয় নৃত্য'। এই গৌড়ীয় নৃত্য পুনরুদ্ধারের পিছনে যার অবদান তিনি হলেন নৃত্য গবেষিকা এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্য বিভাগীয় প্রধান ডঃ মহুয়া মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য প্রদেশের মতো প্রাচীন বাংলায় (অর্থাৎ পূর্বে যার নাম ছিল গৌড়বঙ্গ) এক বিশেষ ধরনের নৃত্যশৈলীর প্রচলন ছিল। কালের স্রোতে বিভিন্ন রাজনৈতিক অবক্ষয়ের ফলে এই নৃত্যশৈলী অবলুপ্ত হয়ে যায়। একথা থেকে সহজেই অনুমেয় যে এই নৃত্যধারা আধুনিক সংযোজন হলেও এর রূপ পরিশীলিত, কিন্তু আধুনিক নয়। প্রাচীনকাল থেকেই গৌড়বঙ্গের এই নৃত্যধারা প্রাচীন ধ্রুপদী নৃত্যশৈলীর অন্যতম অঙ্গ। ভারততত্ত্ববিদ অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ সালে গৌড়ীয় নৃত্য— এই নামকরণটি করেন। প্রাচীন বাংলার এই নৃত্যশৈলী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগে এই নৃত্যশৈলী চর্চার ভৌগোলিক সীমানা ও গৌড়ীয় নৃত্য নামকরণের স্বপক্ষে কী যুক্তি দেখানো হয়েছে তা আলোচনা করা দরকার।

প্রাচীনকালে 'গৌড়' ও 'বঙ্গ' এই শব্দ দুটি পৃথক পৃথক স্থান বোঝাতে ব্যবহৃত হলেও 'ঐতরেয় আরণ্যক-এ' 'বঙ্গ-মগধ' নামে একটি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে গৌড় বলতে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ বোঝালেও খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী ও তারপরে গৌড় বলতে সমগ্র বঙ্গভূমি এবং বৃহত্তর বঙ্গ বলতে বর্তমান ঝাড়খণ্ড সহ অসমের কিছু অংশ বোঝাত। গোপাল হালদারের লেখা 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা' থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সীমাস্বরূপ যে ভূ-খণ্ডটি আমরা পেয়ে থাকি তা হল এরূপ— 'উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয় থেকে নেপাল, সিকিম, ভূটান রাজ্য। উত্তর-পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ উপত্যকা, উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি, পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া-জয়ন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বাহিয়া দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত, পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগণা ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম-কেওঞ্জর-ময়ূরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই সীমার মধ্যে বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ, বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য— এই ভূখণ্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙ্গালির কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্ম-কর্ম-নর্মভূমি।' এই তথ্য দ্বারা প্রাপ্ত গৌড়বঙ্গের এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলটিকে আমরা প্রাচীন বাংলার নৃত্যাঞ্চল বলে ধরে নিতে পারি। গৌড়রাজ শশাঙ্ক 'গৌড়াধিপ' বলে পরিচিত ছিলেন। পাল সম্রাটদের সময় রাজ্যবিস্তারের ফলে গৌড় বলতে বৃহত্তর ভূখণ্ডকে বোঝানো হতো। অপরদিকে চৈতন্য মহাপ্রভু যে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা ছিল গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত এবং চৈতন্যদেব কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বলে পরিচিত। বাণভট্টের রচনা, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সাহিত্য দর্পণ ও দণ্ডির কাব্যাদর্শে 'গৌড়ীয়' রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাকৃত ব্যাকরণে যেমন গৌড়ী ভাষার উল্লেখ পাওয়া যায় তেমনি রামমোহন রায়ের লেখা ব্যাকরণও 'গৌড়ীয়' ব্যাকরণ বলে পরিচিত। এছাড়া বাংলার স্থাপত্যরীতি চারচালা বা আটচালার গঠনকে গৌড়ীরীতি বলে উল্লেখ করা হয়। মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে যে সপ্তগীতের উল্লেখ পাই তার মধ্যে গৌড়ী বা গৌড়ীকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীত শাস্ত্রে প্রাচীনকাল থেকেই গৌড়ী বা গৌড়ীয় পদ্ধতির উল্লেখ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি নাট্যশাস্ত্রে গৌড়বঙ্গের নর্তক-নর্তকীদের বেশভূষা ও রূপসজ্জার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এছাড়া গৌড় কৌশিকী, গৌড় পঞ্চমা রাগের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করার উল্লেখ রয়েছে। ওড়িশার সঙ্গীত শাস্ত্রকার মহেশ্বর মহাপাত্র রচিত 'অভিনয় চন্দ্রিকা'তে যে সাত ধরনের নৃত্যশৈলীর উল্লেখ পাওয়া যায় তার মধ্যে গৌড়বাসীদের নৃত্যশৈলীর কথা পাওয়া যায়। উপরোক্ত নানা কারণে ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই নৃত্যের নামকরণ করেছেন গৌড়ীয় নৃত্য।

এখন দেখা যাক বাংলার এই নৃত্যশৈলী যা বর্তমানে 'গৌড়ীয় নৃত্য' নামে পরিচিতি লাভ করেছে তা কি সত্যিই শাস্ত্রীয় নৃত্য? শাস্ত্র অনুযায়ী যে নৃত্যশৈলী চর্চা করা হয় তাকে বলে শাস্ত্রীয় নৃত্য। চারটি মূল উপাদান যেমন (১) স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, (২) সঙ্গীত শাস্ত্র ও নাট্যশাস্ত্র, (৩) প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস, (৪) গুরুপরম্পরা লোকায়ত নৃত্য— এগুলিকে আমরা শাস্ত্রীয় নৃত্যের মূল উৎস বলে ধরে নিতে পারি। গৌড়ীয় নৃত্যের মধ্যেও এই চারটি মূল উৎস বিদ্যমান।

(১) স্থাপত্য ও ভাস্কর্য— প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার বিভিন্ন মন্দির গাত্রে যে সমস্ত নৃত্যরত ভাস্কর্য উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল, দেওলিয়ার মন্দির (বর্ধমান), বহুলাপাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দির, দোহারের সরেশ্বর ও শৈলেশ্বর মন্দির (বাঁকুড়া), বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দির (বাঁকুড়া), শ্যামরায় মন্দির (বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া), আঁটপুরের রাসমন্দির (হুগলী), গড়পঞ্চকোট পাহাড়ের গাত্রে মল্লরাজাদের আমলের টেরাকোটার মন্দির, বরাকরের বেগুনিয়া মন্দির (বর্ধমান), আজুড়িয়া গ্রামে চারণদেব রাসমঞ্চ (মেদিনীপুর), সোনাখালির পঞ্চানন শিবঠাকুরের (মেদিনীপুর) নাটমন্দির প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলি ছাড়াও পাণ্ডুয়ার 'আদিনা মসজিদ'-এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায়। অনেকে মনে করেন, আদিনাথের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে এর নাম হয়েছে 'আদিনা'।

(২) সঙ্গীতশাস্ত্র ও নাট্যশাস্ত্র— বাংলার নৃত্য চর্চার কথা আমরা নাট্যশাস্ত্রেও পেয়ে থাকি। নাট্যশাস্ত্রের চতুর্দশ অধ্যায়ে আমরা যে চার প্রকার প্রবৃত্তি— নাট্য অথবা নৃত্যর উল্লেখ পেয়ে থাকি সেগুলি হল দাক্ষিণাত্য, অবন্তী, পাঞ্চালী ও ঔড্রমাগধী। এই ঔড্রমাগধী নৃত্যধারা থেকেই ওড়িশি ও বর্তমানে গৌড়ীয় ও সত্রিয় (অসমের শাস্ত্রীয় নৃত্য) নৃত্যশৈলীর জন্ম হয়েছে। এছাড়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, দ্বাদশ ও চতুর্দশ শতকে বহু নাট্য সাহিত্য রচিত ও চর্চিত হয়েছে, যেগুলি গৌড়বঙ্গের শাস্ত্রীয় নৃত্যের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। যেমন তারা ও মঞ্জুশ্রী স্তোত্র, লোকানন্দ নাটক (চন্দ্রগোমিন রচিত ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতক), বাসবদত্তা (সুবন্ধু রচিত ৬ষ্ঠ শতক) ইত্যাদি। বৌদ্ধ সাধকদের সাধন সঙ্গীতে বাঙালীদের নাট্যাভিনয়ের কথা আমরা চর্যাপদ ও নাথ সাহিত্যে পেয়ে থাকি। পণ্ডিত শুভঙ্করের সঙ্গীত দামোদরে নৃত্য ও নাট্য সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য থাকলেও আমরা গৌড়ীয় নৃত্য-শিল্পীরা পণ্ডিত শুভঙ্করের লেখা শ্রীহস্ত মুক্তাবলীকে শাস্ত্র গ্রন্থ হিসাবে মেনে নিয়েছি।

(৩) প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস— 'কলহণের' রাজতরঙ্গিনীতে উল্লেখ আছে কাশ্মীরের রাজা জয়পীর যখন

পৌণ্ড্রবর্ধন (বর্তমানে পাণ্ডুয়া) শহরে এসে উপস্থিত হন তখন তিনি দেখেন কার্তিকের মন্দির কমলা নামে এক দেবদাসী গীত বাদ্য সহযোগে ভরত নাট্যশাস্ত্র অনুসারে লাস্যাঙ্গ নৃত্য পরিবেশন করছেন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', মনসামঙ্গল, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় এবং মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও বাংলার নৃত্য চর্চার কথা বিদ্যমান।

(৪) গুরু পরম্পরা লোকনৃত্য — শাস্ত্রীয় নৃত্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল গুরু পরম্পরা লোকনৃত্য। এই লোকনৃত্যগুলি নগরে চর্চিত শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলিকে অনুকূল পরিবেশে যেমন রসদ জুগিয়ে এসেছে তেমনি প্রতিকূল পরিবেশে সেগুলি আবার নাগরিক জীবনের অন্তরালে থেকে গেছে। দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যশৈলী ভরতনাট্যম তৈরির পিছনে ভগবতমেলা, কুরুভঞ্জী, কুচিপুড়ী গ্রামীণ নাট্য, সাদির, তেরুকুথুরের (পথনাটক) প্রভাব, কথাকলি নৃত্যশৈলীর ওপর কুডিয়াট্টম, রামনাট্যম, কৃষ্ণনাট্যমের প্রভাব এবং ওড়িশি নৃত্যশৈলীর ওপর মাহারী গোটিপুত্ত ও বন্ধ্যানৃত্যের প্রভাব যেমন আছে, তেমনি গৌড়ীয় নৃত্যের ওপরে পুরুলিয়ার ছৌ, নাচনী, বিষহারা, ওঝা, কুশান, গম্ভীরা, বাউল, কীর্তন-এর প্রভাব রয়েছে।

স্বভাবতই মনে হতে পারে যে, এত কিছু প্রামাণ্য তথ্যাদি থাকা সত্ত্বেও বাংলার বুক থেকে এরকম একটি নৃত্যশৈলী লুপ্ত হয়ে গেল কি করে? এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের দেখতে হবে মধ্যযুগে ও আধুনিক যুগে আমাদের বাংলার রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি কি ছিল। (ক) সুবর্ণময় পাল ও সেন যুগে যে সংস্কৃতি চর্চা শুরু হয়েছিল তা তুর্কি আক্রমণের ফলে নষ্ট হয়ে গিয়ছিল। সুদক্ষ শাসনের অভবে বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ থেকে যেমন বাংলাকে রক্ষা করা যায়নি, তেমনি বারবার বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে শিক্ষা সংস্কৃতি বিনষ্ট হতে থাকে। (খ) প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্যদেবের সময় যে সমস্ত সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা শুরু হয়েছিল পুনরায় বর্গি আক্রমণের ফলে তা ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। (গ) মধ্যযুগে মুসলমান শাসন ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবও দেখা যায়। মুসলমান শাসকরা হিন্দু দেবদেবীর পূজা করলে বেত্রাঘাত করতো। (ঘ) সুপ্রাচীন কাল থেকে যে সমৃদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিন্যস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা চলে আসছিল তা দেশবাসীর দেহমনে এক ধরনের সনাতনী নিশ্চিন্ততা ও ভাগ্যনির্ভরতার ধূসর আকাশ বিস্তৃতি লাভ করেছিল। (ঙ) সংকীর্ণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে অনেকে মেনে নিলেও একদল মানুষ গোপনে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পাশাপাশি অন্য ধর্মাচারণ করতে শুরু করে। এই গোপন ধর্মাচারণ করা মানুষগুলি বিভিন্ন অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ, ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়ে গিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

এবার আমরা আধুনিক যুগের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাব আধুনিক যুগের রাজনৈতিক কারণগুলির মধ্যে ঔপনিবেশিক শোষণই এক বিরাট অধ্যায় জুড়ে আছে। আগেই বলেছি, গুরু পরম্পরা লোকনৃত্য হচ্ছে গৌড়ীয় নৃত্যের একটি মূল উৎস। আর এই লোকনৃত্যগুলি চর্চা হতো মূলত গ্রামে। কিন্তু ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে গ্রামের মানুষদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। গ্রামীণ কৃষিজীবী মানুষ কৃষক বিদ্রোহে সামিল হয়। সন্ন্যাসী, ফকির ও বাউল সম্প্রদায়ের মানুষ মোঘল শাসনের মধ্য ও শেষ ভাগে জমির দখল ও জমিদারী পেয়েছিল। তা সত্ত্বেও তারা দলবেঁধে তীর্থ ভ্রমণ করতে যেত। কিন্তু ইংরেজদের তীর্থ ভ্রমণের উপর কর ধার্য করা এবং ভ্রমণে বাধা দেওয়ার ফলে এই সন্ন্যাসী, ফকির সম্প্রদায়ের মানুষও তাদের বর্ণময় সাংস্কৃতিক জীবন ছেড়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭০-৮০-র দশকে একে একে চোয়াড় বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই সময় বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, রংপুর, বর্ধমান ও দিনাজপুরের কৃষিজীবী মানুষ যারা সাধারণত লোকশিল্প যেমন পাইক বা পাইকান নৃত্য, লাঠি নৃত্য, কিশোরী ভজনা সম্প্রদায়, কর্তাভজা সম্প্রদায় যার প্রবর্তক ছিলেন আউলচাঁদ সেগুলি ক্রমশ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়।

অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব বাঙালী জীবনে পড়েছিল। এই পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা যথা রক্ষণশীল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবের অবসান যেমন হয়েছিল, তেমনি খৃষ্টধর্মের ও নানা মতাদর্শের প্রভাবের ফলে বাঙালির জীবনদর্শন বহু ধরনের চিন্তাধারার সম্মুখীন হয়ে বিপর্যস্ত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের ফলে যে নব্যসংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল, তা বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়ায়। এইসময় একদল বাবু সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। তারা নিজেদের অতীত সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির রসাস্বাদনে ব্যস্ত থাকে। আবার একদল শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে বঙ্গভঙ্গ, আইন অমান্য ও ভারতছাড়ো প্রভৃতি সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। এঁরা সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেদের নিয়োজিত করে। এই সময়ের সংস্কৃতি হিসাবে আমরা রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, রজনীকান্ত প্রভৃতি লেখকের বা কবির কিছু গান পেয়ে থাকি। এই সময় বাঙালীর অন্য কোনও কিছু চিন্তা করার মতো ইচ্ছা ও মানসিক শক্তি ছিল না। স্বাধীনতার কিছু আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের দৌলতে সাংস্কৃতিক চর্চাকেন্দ্র হিসাবে আমাদের প্রাপ্তি শান্তিনিকেতন। আর এই শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র-নৃত্য চর্চাও শুরু করেন। বলা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথ নিজে নৃত্যশিল্পী না হয়েও নৃত্যান্দোলনের কথা ভেবেছেন। নৃত্যকে সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে মর্যাদা দিয়েছেন। ঊনবিংশ

শতক থেকে বাংলাদেশের নগরবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে নৃত্যচর্চা ছিল বিলাসের সামগ্রী। তাই বাঈজী, খেমটাওয়ালী, যাত্রা ও থিয়েটারের নর্তক-নর্তকীদের কাছেই নৃত্যচর্চা সীমাবদ্ধ ছিল। কুরুচিপূর্ণ বিলাসের বাইরেও যে নৃত্যকলার কোনও স্থান থাকতে পারে তা নগরের শিক্ষিত সমাজ উপলব্ধি করতে না পারায় নগরবাসীদের কাছে নৃত্যচর্চার প্রচলন ছিল না। যদিও এই সময়েও বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে কিছু কিছু লোকনৃত্য অক্ষুণ্ণ ছিল। শিক্ষিত জনসমাজ যারা এই লোকনৃত্যগুলিকে পরিশীলিত রূপ দিতে পারত তাদের অবহেলায় অধিকাংশ লোকনৃত্য লুপ্ত হলেও এখনও যা আছে তা অত্যন্ত গর্বের। তবে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আর এক মেধাবী ছাত্র বিদেশী রুচির প্রভাব থেকে আমাদের সংস্কৃতিকে ব্রতচারীর মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি হলেন গুরুসদয় দত্ত।

পরবর্তীকালে এক বিশেষ ধরনের নৃত্যচর্চা বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষে শুরু হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক নৃত্যশৈলী, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা, পাশ্চাত্য ব্যালে— এ সমস্ত কিছুর মিশ্রণে এক অপূর্ব নৃত্যশৈলী যিনি তৈরি করলেন তিনি হলেন উদয়শঙ্কর। ১৯২৬ সালে আনাপাভলোভার দুটি ব্যালে 'রাধাকৃষ্ণ' ও 'ইণ্ডিয়ান ম্যারেজ'-এ মুখ্য নৃত্যশিল্পী ও কোরিওগ্রাফার হিসাবে উদয়শঙ্করের আত্মপ্রকাশ। ১৯৩৯ সালে আলমোড়ায় 'উদয়শঙ্কর কালচারাল সেন্টার' তৈরি হয়। ১৯৭৭ সালে তাঁর মৃত্যুর পরেও বর্তমান কাল পর্যন্ত এই বিশেষ নৃত্যশৈলীকে বাঙালী তথা আপামর ভারতবাসী এমনকি বিদেশীরাও গ্রহণ করেছেন।

উপরোক্ত এই আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সুদূর মধ্যযুগ থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত বাঙালী জাতি কিভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের স্বীকার হয়েছিল। আর বছরের পর বছর এই শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে আমরা নিজেরাই সংস্কৃতি ও কলাবিদ্যার প্রধান অঙ্গ নৃত্যের ওপর আস্তরণ টেনে দিয়েছিলাম। প্রাক্ স্বাধীনতা ও স্বাধীনোত্তর যুগে যখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এক এক করে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় নৃত্যশৈলীগুলি যেমন ভরতনাট্যম, কথাকলি, কুচিপুড়ী, ওড়িশি, কত্থক ইত্যাদি স্বীকৃতি লাভ করছে, তখন আমরা বাঙালীরা উদ্বাস্তু সমস্যার সম্মখীন হয়েছি। সেই সময় বাঙালীরা বাংলার কিছু লোকনৃত্য, রবীন্দ্রনৃত্য ও উদয়শঙ্কর প্রবর্তিত এক বিশেষ নৃত্যশৈলীকে বাংলার নৃত্যশৈলী হিসাবে মেনে নিয়েছি, আর এই নৃত্যশৈলীগুলি কলকাতায় নিয়মিত চর্চা হতো। যেহেতু কলকাতা এক সময় ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল এবং যা পরবর্তীকালে পশ্চিমবাংলার রাজধানী রূপে স্বীকৃতি লাভ করে তাই কলকাতার বক্তব্যকেই বাংলার সংস্কৃতি বলে মান্য করা হতে থাকে। যে নৃত্য চর্চা প্রাচীন বাংলায় শুরু হয়েছিল, তা কিভাবে কালের স্রোতে ক্ষয়িষ্ণু রূপ ধারণ করে লুপ্ত হয়ে যায় উপরোক্ত এই আলোচনা থেকে তা সুস্পষ্ট। বাংলার এই প্রাচীন নৃত্যশৈলী যা বর্তমানে 'গৌড়ীয় নৃত্য' নামে পরিচিত তাকে আমরা ডঃ মহুয়া মুখোপাধ্যায়ের গবেষণার মাধ্যমে উদ্ধার করেছি। প্রায় ৩০০-র বেশি ছাত্রছাত্রী অনেক প্রতিবন্ধকতা ও সমালোচনা সত্ত্বেও গৌড়ীয় নৃত্য চর্চায় ব্রতী রয়েছে। আসুন আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হই, বাংলার এই প্রাচীন নৃত্যশৈলীকে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করার।

তথ্যসূত্র ঃ— গৌড়ীয় নৃত্য (এশিয়াটিক সোসাইটি), বাংলার লৌকিক নৃত্য - ডঃ মহুয়া মুখোপাধ্যায়, বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্য) - ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাঙ্গালীর ইতিহাস - নীহার রঞ্জন রায়, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় - অক্ষয় কুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (প্রাচীন ও মধ্য) - গোপাল হালদার, গঙ্গারিডি ও বঙ্গভূমি - ডঃ প্রভাত কুমার ঘোষ, নাট্যশাস্ত্র (ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী সম্পাদিত), রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ - শিবনাথ শাস্ত্রী, হে মহাজীবন - শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, প্রাচীন বাঙলা ও বাঙ্গালী - ডঃ সুকুমার সেন।